আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা চর্চার ধারা

আনন্দ বিকাশ চাকমা

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookAnanda

পটভূমি

পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পরিচালিত বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে একটি গৌরবময় ঘটনা। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে এ আন্দোলন সমগ্র জাতিকে প্রথমবার নাড়া দিয়েছিল এবং এ আন্দোলনের ফসল হিসেবে বাংলা ভাষা তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৬'র সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'The State Language of Pakistan should be Urdu and Bengali.' পরে ১৯৬২ সালের সংবিধানেও এ স্বীকৃতি বলবৎ থাকে (Akanda, 2013, p. 149)। বাঙালি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্রমধারায় এটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক অর্জন। ভাষা আন্দোলনের জঠর থেকে জন্ম নেয় বাঙালির ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাজাত্যবোধের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। চল্লিশের দশকের ধর্মভিত্তিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিপরীতে পঞ্চাশের দশকের অসাম্প্রদায়িক ও ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ব-বাংলার মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের লেখায় এমন অনুভবের ছাপ স্পষ্ট। এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহমেদ লিখেছেন:

> পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকরা যখন বাঙালিদের ওপর ইসলাম ও জাতীয় সংহতির নামে উর্দু ভাষা ভাষা চাপিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হলো তখনই শুরু হয়েছিল আমাদের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই বাঙালিরা তাদের সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। এই সংগ্রাম প্রথমে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং পরিশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণতি লাভ করলো (আহ্মদ, ২০১৬, পৃ. ৯৬)।

বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্বাধিকারের চেতনা হলো জাতীয়তাবাদের মূল অভিব্যক্তি। এ চেতনার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে, যার মাধ্যমে অর্জিত হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র– বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার সগৌরবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। দেশের সংবিধান রচিত হয় বাংলা ভাষায়। একুশে ফেব্রুয়ারির অবিনাশী চেতনা ও শহিদদের স্মরণে দেশজুড়ে নির্মিত হতে থাকে শহিদ মিনার। মাতৃভাষা বাংলাকে সরকারি অফিস আদালত, প্রচার-মাধ্যম ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মানোন্নয়ন করার প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী বাঙালিরাও একুশের চেতনা দ্বারা শাণিত হয়। তারা বাঙালির মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করার উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংগঠনের স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভূত হয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা 'ইউনেস্কো' হলো এর জন্য যথাযথ

প্রতিষ্ঠান। পূর্বাপর ভেবে সকল প্রক্রিয়া মেনে বাঙালির মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ইউনেস্কো বরাবর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর আসে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ইউনেস্কোর ৩০তম সম্মেলনে ১৮৮টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধির ভোটে ঐদিন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলাভাষার প্রতি বিশ্ববাসীর এরূপ স্বীকৃতিতে সমগ্র দেশবাসী আনন্দিত ও গর্বিত হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো জাতিগোষ্ঠীর লেখক সিং ইয়ং ম্রোর বয়ানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। তাঁর মতে, ''বিংশ শতাব্দীর বিদায়ের লগ্নে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষিত হওয়ায় শুধু বাঙালি জাতি নয়, বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও নতুন চেতনার উদয় হয়েছে'' (ম্রো, ২০০৫, পৃ. ৬৯)। এর মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশে জাতিগুলোর স্বকীয় মাতৃভাষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নতুনভাবে মান্যতা লাভ করে। এরপর বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী দেশে-দেশে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন-পরাধীন সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষ মাতৃভাষা রক্ষা, চর্চা ও উন্নয়নের প্রতি যত্নবান হয়। কারণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার অন্তর্নিহিত দর্শনটিই হলো পৃথিবীর সকল ভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা এবং প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষ যেন তাদের মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ এবং জ্ঞান অর্জন করে আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি নানা বৈচিত্র্যময় জনপদের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। স্মরণাতীতকাল থেকে এখানে বসবাস করে আসছে দশ ভাষাভাষী ১১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা: চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, খিয়াং, লুসাই, চাক, পাংখোয়া, খুমি, বম। এরা বাংলাদেশের নাগরিক, তবে বাংলা তাদের মাতৃভাষা নয়; শিক্ষার মাধ্যম ও আন্তঃজাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার যোগাযোগের ভাষা হিসেবে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। এসব জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক আমলে পৃথক প্রশাসনিক আইনের অধীন ছিল। কারণ, ঔপনিবেশিক যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস স্বতন্ত্রধারায় বিকশিত হয়েছিল। পার্বত্য জনপদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ছিল কেবল জীবনধারণ পর্যায়ের। বাংলাদেশের সমতল এলাকায় যেখানে বাঙালিদের মধ্যে ভাষাগত সমরূপতা বিরাজমান, সেখানে পার্বত্য অঞ্চলে ভাষা-বৈচিত্র্যই যেন নির্ণায়ক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলের ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক সীমারেখা যেমন সহজে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি তার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের স্বাতন্ত্র্যও সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। সংখ্যায় অল্প হলেও প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক কথ্যভাষা আছে। তবে নিজস্ব হরফ বা অক্ষরসমেত লেখ্যরূপ অনেক নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষাতে নেই।

আবার তারা ভাষার বিচারেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ভাষা-গবেষক ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ মত দিয়ে থাকেন। যেমন জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে বৃহত্তম জাতিসত্তা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা ইন্দো-আর্য ভাষা-পরিবারভুক্ত বলে স্যার জি. এ. গ্রিয়ারসন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত চিহ্নিত করেছেন। স্যার গ্রিয়ারসনের এই বর্গীকরণ বাংলাদেশের গবেষকরাও গ্রহণ করেছেন (বিশ্বাস, ২০০৮, পৃ. ১৩)। অন্যদিকে মারমা জাতিসত্তার ভাষা হলো বৃহত্তর চিনা-তিব্বতী ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত তিবেতো-বার্মান শাখাভুক্ত। ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষার নাম ককবরক, যা চিনা-তিব্বতি ভাষা-পরিবারের

অন্তর্গত বোড়ো শাখাভুক্ত। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্প জাতিগোষ্ঠী; যেমন বম, লুসাই, পাংখোয়া ও খিয়াং এবং চাক জাতিসত্তার মাতৃভাষা চিনা-তিব্বতি ভাষা পরিবারের উপশাখা কুকি-চীন গোত্রীয় (সিকদার, ২০১১, পৃ. ৯)। চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও ম্রো ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা থাকলেও অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলো রোমান হরফে তাদের মাতৃভাষাকে লেখ্যরূপ দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। যেহেতু পার্বত্য অঞ্চল জাতীয়তা, ভাষা ও সংস্কৃতির বিচারে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবেই গড়ে উঠেছিল, সেহেতু দু'একটি জাতিগোষ্ঠী; বিশেষ করে চাকমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সাথে সমতলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মানুষ ও সমাজের সাথে ভাব ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিসরটা ছিল খুবই সীমিত। ভাষা-গবেষক অশোক বিশ্বাসও একই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ''চাকমা, হাজং, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, ত্রিপুরা ও বোড়ো ভাষাগুলো ছাড়া কুকি-চীন গোত্রীয় অন্যান্য শাখার ভাষার সাথে বাংলার তেমন যোগাযোগ বা সম্পর্ক কখনো তেমনটা গড়ে ওঠেনি'' (বিশ্বাস, ২০০৮, পৃ. ১৭৭)। তাই এসব ভাষার মানুষের মধ্যে পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের ভাষাভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ছিল না বললেই চলে।

কুকি-চিন ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো ছাড়া ইন্দো-আর্য ভাষা-পরিবারভুক্ত চাকমাদের সাথে বাংলা ভাষার যোগাযোগ যথেষ্ট নিবিড়। একজন চাকমা ভাষা-গবেষকের মতে, বর্তমান চাকমা ভাষার শব্দভাণ্ডার ষোল আনার চৌদ্দ আনাই বাংলা ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত (গিরিনির্ঝর, ১৯৮৭, পৃ. ১০)। উভয় ভাষা ও সংস্কৃতি একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বহমান রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্যভাষা বাংলা হওয়ায় ককবরকভাষী ত্রিপুরাদের সাথে বাংলা ভাষার যোগাযোগও বহু যুগের পুরোনো। ১৯৭৯ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরাদের ককবরক ভাষাও রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ত্রিপুরারা দীর্ঘ সময় ধরে বাংলালিপিতেই নিজেদের ককবরক ভাষা চর্চা করতেন। ভারতের ত্রিপুরারা নিজেদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষার খাতিরে এখন রোমান হরফে ককবরক চর্চা করছে (ত্রিপুরা, ২০১৫, পৃ. ১২৬)। বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জন্যও একথা সত্য। দেশ আলাদা হলেও উভয় দেশের ত্রিপুরাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রায় অটুট। ফলে বাংলাদেশের ত্রিপুরারা পূর্বে বাংলা হরফে ককবরক ভাষায় সাহিত্যচর্চা করলেও এখন রোমান হরফ ব্যবহার করে পাঠ্যবই রচনা করছে। এতদিন হরফ নির্বাচন নিয়ে জটিলতা বা সিদ্ধান্তহীনতা ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও ছিল ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা। ভাষা আন্দোলনের চেতনার বাস্তবায়ন শুধু বাংলা ভাষার উন্নয়নকে ঘিরে আবর্তিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চাও ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক।

মারমাদের সাংস্কৃতিক অভিমুখ দক্ষিণমুখী। তাদের সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির তুলনায় বর্মি-আরাকান ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বেশি। তারা বর্মি পঞ্জিকা অনুসরণ করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করে (চৌধুরী, ২০২১, পৃ. ২৩-৪১)। ভাষা ও বর্ণমালার মূলও নিহিত আছে বর্মি ভাষা ও বর্ণমালার মধ্যে। তবু তাদের নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতির বিকাশধারায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্যকে অস্বীকার করে না। স্মরণাতীতকাল থেকে মারমা জাতিসত্তার মানুষ ক্যাং বা বৌদ্ধবিহারভিত্তিক মাতৃভাষা শিক্ষা করতো। বাংলাদেশ আমলে কিন্তু মারমাদের আর্থ-সামাজিক জনজীবনে অর্থনৈতিক উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রান্তিকতা, বৃহৎ সাংস্কৃতিক শক্তির প্রভাব, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর আনুগত্য নিয়ে সন্দেহপরায়ণতা প্রভৃতি কারণে বিহারভিত্তিক প্রচলিত মাতৃভাষার চর্চাও স্তিমিত হয়ে পড়ে (চেদনা, ২০১১, পৃ. ১৪)। অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অগ্রসর চাকমা, মারমা ও

ত্রিপুরাদের ভাষা-পরিস্থিতি যদি এমন হয়, তাহলে অন্য ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তার মাতৃভাষা-পরিস্থিতি কেমন হবে তা সহজে অনুমেয়।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষাপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় নীতিও ছিল অনেকটা একপেশে। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষানীতিও মোটেই বাংলাছাড়া অন্যান্য মাতৃভাষা শিক্ষার সহায়ক ছিল না। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে একক ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র ঘোষণা করা হলে দেশের সীমানাভুক্ত অন্য জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা কার্যত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আমেনা মহসিনের পর্যবেক্ষণটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, ''On 23 January 1974, the Parliament passed a Bill declaring Bangladesh a uni-cultural and uni-lingual nation-state. The stage was thereby set for carving out a homogenous nation-state patterned around the dominant Bengali culture.'' (Mohsin, 2002, p. 63). তাই এসব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এ ধরনের রাষ্ট্রীয় ভাষানীতির মধ্যে 'ভিন্ন সাংস্কৃতিক একীভূতকরণ'-এর প্রয়াস লক্ষ করে এবং নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষিত অবস্থায় দেখতে পায়। এমতাবস্থায় স্বাধীনতা-উত্তরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম *পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি* পাহাড়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতির সংকট দেখতে পায়। সংগঠনটি পাহাড়ের জাতিসত্তাগুলোর আত্মপরিচিতি ধরে রাখা এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত পৃথক জুম্ম জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করে। অধ্যাপক ভেলাম ভেন সেন্দেলের মতে, ''পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রমশ বহু সংখ্যায় আবির্ভূত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি পাহাড়ে বাঙালি সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরাগ প্রকাশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে চিহ্নিত করার জন্য একটি নতুন পরিভাষা প্রবর্তন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এখন থেকে বলা হতে থাকে 'জুম্ম'। জেএসএস এ পরিভাষা পরিবর্তনের ঘটনাকে কাজে লাগায় সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের এক ছত্রছায়ায় আনার উদ্দেশ্যে'' (সেন্দেল, ১৯৯৮, পৃ. ১০২-১৫১)। এ অবস্থায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে তাদের মধ্যে এ সমস্যাটা প্রকট হয়। যাদের মাতৃভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই, তারা বাংলা বা রোমান বর্ণমালাকে সহজে বেছে নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ চাকমা ও মারমাদের নিজস্ব বর্ণমালা থাকলেও তার চর্চা ছিল খুবই সীমিত। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে চাকমা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা হতো বাংলালিপিতে। এখন জুম্ম সংস্কৃতির কাঠামোতে জাতিগতভাবে নিজস্ব হরফে মাতৃভাষা-চর্চার তাগিদ অনুভূত হয়। মারমাদেরও একই বাস্তবতা।

পার্বত্য অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চা বেগবান না হওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ভাষানীতিতে বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষাগুলোর স্বীকৃতি না থাকা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব; সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ফলে পাহাড়ি ভাষাগুলোর লিখন, পঠন ও প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সুবিধা ও আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রায়োগিক সুবিধার অনুপস্থিতি; দ্বিতীয়ত, ১৯৭৫ সালের পর থেকে ইন্সারজেন্সির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা ও অনিরাপদ জনজীবন; তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ভাষা-শিক্ষক, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই ও শিক্ষা-উপকরণের অভাব; চতুর্থত, অধিকাংশ পাহাড়ি জাতিসত্তার নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় কোন হরফে মাতৃভাষা চর্চা সুবিধাজনক হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐকমত্য না থাকা ও

পঞ্চমত, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাগুলোর ভাষা, ব্যাকরণ ও বানানরীতি নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত কাঠামো গড়ে না ওঠা। এসব কারণে বিশ শতক অবধি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চার অগ্রগতি ছিল অতি নগণ্য।

ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চা কোনো কিছুই রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে অসম্পৃক্ত নয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশে ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চার বিকাশও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। আশার কথা, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের সংঘাতপূর্ণ অশান্ত পরিস্থিতির আপাত অবসান ঘটে। চুক্তির ভূমিকাংশে পার্বত্য অঞ্চলের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করাকে চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হয়। পার্বত্য চুক্তির ৩৩ খণ্ডের (খ) ধারায় আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিধান রাখা হয় এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখে চুক্তি অনুসারে গঠিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ৩৬ (ঠ) ধারায় মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিধান রাখা এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় আগ্রহী করে তোলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিশুদের পক্ষে মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা সহজ, বোধগম্য ও আনন্দদায়ক এবং মেধা বিকাশে সহায়ক। অধিকন্তু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সাথে নিজস্ব চেনা পরিবেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক থাকায় তারা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে। এসব বিবেচনা করে অন্তত প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত নিজেদের মাতৃভাষায় পড়ালেখা করার সম্ভাবনা দেখে নৃ-গোষ্ঠীগুলো স্ব স্ব মাতৃভাষার উন্নয়নে সোচ্চার হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চিন্তায় নবপ্রেরণার সঞ্চার ঘটায়। এরপরে দেশে ও বিদেশে সংঘটিত কিছু ঘটনা ও পদক্ষেপ পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চায় উৎসাহ সৃষ্টি করে। যেমন ১৯৯৯ সালে বাঙালির ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষে ২০১০ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্‌বোধন– এ দুটি ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্নভাষী জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মাতৃভাষা-চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি করে। একজন চাকমা লেখক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর ও আন্তর্জাতিকভাবে মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পর আদিবাসীদের মাতৃভাষা-চর্চার গতিধারা সম্পর্কে বলেন:

> আদিবাসী পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষাকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার দাবী দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এ দাবী সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা ইউনেস্কোর এক অধিবেশনে '২১ ফেব্রুয়ারি'কে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালন করার ঘোষণা আমাদের এ অর্জনকে আরও অনিবার্য করে তুলেছে (চাকমা, ২০১০, পৃ. ৫১-৫৫)।

এর পরম্পরায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরবর্তীকালে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর সৃষ্টি করে। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য অংশে 'প্রারম্ভিকলগ্নে শিক্ষাস্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বস্তুত জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালের

জানুয়ারি থেকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম ধাপে ৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষায় (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো ও সাদরি) পাঠ্যবই প্রণয়ন ও বিনামূল্যে বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীবান্ধব ও ভাষাগত অন্তর্ভুক্তিমূলক। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ়করণেও এমন পদক্ষেপের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ সরকার যখন ২০১৪ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজে হাত দেয়, তখন কিছু বাস্তব সমস্যা উপস্থিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের জন্য উপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও ঐ ভাষার উপযুক্ত লেখক প্রাপ্তি, লিপি বা হরফ নির্বাচন সংকট (চাকমা ও মারমাদের নিজস্ব লিপি থাকলেও ত্রিপুরা, গারো ও ওঁরাওদের মাতৃভাষার নিজস্ব হরফ নেই), একই শ্রেণিতে বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, অক্ষরগুলো কম্পিউটারে কম্পোজ করার মতো উপযুক্ত সফটওয়ার বা কি-বোর্ডের অভাব ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। অবশেষে এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ২০১৭ সাল থেকে ইউনিসেফের সহায়তায় ৪টি নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবই প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজ শেষ করে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। এর মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এ তিনটি নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা-চর্চা, শিখন ও শিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এটি একটি দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। সরকারের এ নীতি মাতৃভাষা-চর্চায় আগ্রহী পাহাড়ি তরুণ সমাজে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। পাহাড়ের শিক্ষিত ও সচেতন তরুণরা মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উদ্যোগকে সফল করার জন্য বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক সমিতি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মাঠ-পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে চাকমা, মারমা ও ম্রোদের দ্বারা পরিচালিত এ ধরনের ভাষাকেন্দ্রিক সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য স্থাপিত তিনটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্য আলোচনাপূর্বক চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো ও অন্যান্য ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চার ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী লেখালেখির হদিশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চর্চা সম্পর্কিত গবেষণার উপাদান খুবই অপ্রতুল। ১৯৯৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ব্যতিত অন্যান্য জাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চার কোনো বিদ্যায়তনিক সুযোগ-সুবিধা না থাকায় এ নিয়ে অ্যাকাডেমিক গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ফলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা প্রসঙ্গটি গবেষকদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। তবে একুশ শতকের সূচনাতে বিদ্যায়তনিক স্তরে দু-একজন বাংলাভাষী ভাষা-গবেষক বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা-গবেষণায় এগিয়ে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ ওরফে সৌরভ সিকদারের নাম এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে স্বীয় মাতৃভাষা বাংলাভাষার গবেষণাজগৎ থেকে আদিবাসী ভাষাজগতে বিচরণ শুরু করেন। তাঁর সম্পাদিত গবেষণাকর্ম ২০১১ সালে *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা* শিরোনামে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে ১০টি আদিবাসী ভাষার উদ্ভব ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু ড. সিকদারের গ্রন্থে পার্বত্য জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চর্চার ঐতিহাসিক ধারা এবং বিগত এক দশকে কয়েকটি আদিবাসী তরুণের মাতৃভাষার চর্চার

বাহন বর্ণমালার উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন, আদিবাসীদের মাতৃভাষা-চর্চায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের যোগসূত্র বা প্রভাব, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কার্যক্রমের প্রভাব ও সংশ্লিষ্টতা নিয়ে আলোচনা অনুপস্থিত এবং সেটা সঙ্গত কারণেই। সরকার প্রাথমিক স্কুলে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের প্রায় এক দশক পর। এরপর অশোক বিশ্বাস *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব* (২০০৮) শীর্ষক গ্রন্থে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যে তিব্বতি-চৈনিক ভাষাগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে চাকমা ও মারমা ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি-চীন গোত্রীয় ভাষাগুলোর সম্পর্ক না থাকায় তিনি ঐসব জাতিসত্তার মাতৃভাষা নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকেন। অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে পাহাড়ের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষা নিয়ে নতুন কোনো গবেষক ও গবেষণার হদিশ পাওয়া যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের মধ্যে কয়েকজন মাতৃভাষাদরদি ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাদের নিজস্ব বর্ণমালায় স্বাক্ষরজ্ঞান ও লিখনদক্ষতা না থাকায় তারা বাংলা অথবা রোমান হরফে সাহিত্যচর্চা করেন। এসব লেখালেখির সাহিত্যিক মান প্রমিত নয় এবং পরিসরও স্ব স্ব ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন, সুগত চাকমার গবেষণার বিষয় চাকমা জাতি, ভাষা ও সাহিত্য; সিং ইয়ং ম্রো লিখেছেন ম্রো ভাষা ও বর্ণমালা নিয়ে; একইভাবে জিরকুং শাহুর লেখার জগত বম জাতি ও ভাষাকেন্দ্রিক। ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা অধ্যয়ন ও অগ্রগতির সামগ্রিক চিত্র এসব গবেষণা ও লেখালেখিতে পাওয়া দুষ্কর। মূলত এসব দিক বিবেচনা করলে পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষা-পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক ছবি পেতে তাদের মাতৃভাষা-চর্চার অতীত ও সাম্প্রতিক ধারা এবং অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বর্তমান প্রবন্ধের পদ্ধতিগত দিক

এ গবেষণা-প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক গবেষণা-পদ্ধতিতে রচিত। প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের জন্য বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষার ওপর প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষা-চর্চা বিষয়ক অবস্থা বোঝার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মাতৃভাষা-চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর কার্যালয় পরিদর্শন করে তাদের প্রকাশিত বইপুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষ করে রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত *জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল* প্রকাশিত সংকলনগুলো ছিল বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চা সম্পর্কে জানার গুরুত্বপূর্ণ উৎস। গবেষণাকালে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অবস্থান করছিলেন কিন্তু মাতৃভাষা-চর্চার সাংগঠনিক উদ্যোগের সাথে এখনও যুক্ত আছেন, তাদেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এ গবেষণা-প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। তবে সময়-স্বল্পতার কারণে সবগুলো জাতিত্তার মাতৃভাষাকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এ প্রবন্ধে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খিয়াং, খুমি, লুসাই ও পাংখোয়াদের মাতৃভাষা-চর্চার অতীত ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পটভূমি

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা সংক্রান্ত ধারণাটির রূপকার ও প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন কানাডাপ্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও তাঁর সহসংগ্রামী আবদুস সালাম। ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি রফিকুল ইসলাম পৃথিবীর ভাষাসমূহকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর উপায় হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব-এর নিকট একটি পত্র লিখেন। উক্ত পত্রে তিনি ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের স্মৃতির স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করেন। সে-সময় মহাসচিবের প্রধান তথ্য কর্মচারী হিসেবে কর্মরত হাসান ফেরদৌসের নজরে আসে এ চিঠি। তিনি ১৯৯৮ সালের ২০শে জানুয়ারি রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ করেন তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রের কারো কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন। সেই পরামর্শ অনুসারে রফিক তার সহযোদ্ধা আব্দুস সালামকে সাথে নিয়ে 'এ গ্রুপ অব মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করান। তাদের প্রতিষ্ঠিত বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষাদরদি গোষ্ঠী ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান বরাবর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার প্রস্তাবসম্বলিত একটি পত্র প্রেরণ করেন। প্রস্তাবের পক্ষে তারা লিখেন, ''বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেটা ছিল তাদের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আজকের পৃথিবীতেও অনেক জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা একই সমস্যা ও বিপদের মধ্যে আছে। কাজেই মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার দাবিটি যুক্তিযুক্ত।" মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স গ্রুপের ওই চিঠিতে ৭ জাতি ও ৭ ভাষার ১০ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন। তাঁরা হলেন অ্যালবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জ্যাসন মোরিন ও সুসান হজিন্স (ইংরেজি), ড. কেলভিন চাও (ক্যান্টনিজ), নাজনীন ইসলাম (মালয়), রেনাটে মার্টিনস (জার্মান), করুণা জোসি (হিন্দি) এবং রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম (বাংলা) (সিকদার, ২০১৯, পৃ. ১১)। এর একটি কপি ইউএন-এর কানাডিয়ান রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফাওলারের কাছেও প্রেরণ করেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর থেকে আবেদনকারীদের জাতিসংঘভুক্ত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন 'ইউনেস্কো'র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের ৩রা মার্চ প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কো সচিবালয়ের ভাষা বিভাগের কর্মকর্তা আন্না মারিয়ার কাছ থেকে রফিকুল ইসলাম একটি চিঠি পান। চিঠিতে মারিয়া জানায়, ''বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই, ইউনেস্কোর পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রস্তাবটি আনীত হতে হবে।'' সৌভাগ্যক্রমে তখন বাংলাদেশও পরিচালনা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র ছিল। ফলে রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের কাজটি অনেকটা সহজ হয়। অতঃপর রফিকুল ইসলাম কানাডা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বাংলাদেশের জন্য গৌরবজনক ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে মন্ত্রণালয় অতি দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি চেয়ে সারসংক্ষেপ পাঠায়। অতঃপর ১৯৯৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে ইউনেস্কোর সদরদপ্তর ও সদস্যদেশসমূহে তা উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব প্রেরিত হয়। প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর প্যারিসে অবস্থিত সচিবালয়ে 30 C/8, COM. II. নং স্মারকে নথিভুক্ত হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে,

> Considering that languages are the very heart of UNESCO's objectives and that they are the most powerful instruments of preserving and developing our tangible and intangible heritage, Bearing in mind also that all moves to promote the dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to development fuller awarness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue, Considering consequently that one of the most effective ways to promote and develop mother tongues is the establishment of an 'International Mother Language Day' with a view to organizing various activities in the Member States and an exhibition at UNESCO Headquarters on that same day, Recognizing the unprecedented sacrifice made by Bangladesh for the cause of mother language on 21 February 1952, Noting that this idea has not yet been adopted at the international level, Proposes that 21 February be proclaimed 'International Mother Language Day' throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very date in1952 (www.unesco.org).

এরপর ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ও তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বিভিন্ন দেশে শিক্ষামন্ত্রী ও ডেলিগেট প্রধানদের সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশের প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায় করেন। অধিকন্তু অধিবেশনের শুরুতে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারি ও এর তাৎপর্য ইউনেস্কোর ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিদের সম্মুখে সবিস্তারে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবও সহপ্রস্তাবক দেশ হতে সম্মত হয়। এভাবে ১৭ই নভেম্বর তারিখে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত হয় এবং ১৮৮টি সদস্য দেশ প্রস্তাবে সমর্থন দিলে সেটি গৃহীত হয়। রচিত হয় নতুন ইতিহাস। এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ইউনেস্কোর (স্মারক নং 30 C/DR 35.) কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে:

> (Submitted by Bangladesh and Saudi Arabia; supported by Oman, Benin, Sri Lanka, Egypt, the Russian Federation, Bahamas, Dominican Republic, Belarus, the Philippines, Cote d' Ivoire, India, Honduras, Gambia, the federated states of Micronesia, Vanauatu, Indonesia, Papua New Guiniea, Comoros, Pakistan, Islamic Republic of Iran, Lituania, Italy and the Syrian Arab Republic) relating to paragraph 05204, the commission recommends that the General Conference proclaim "International Mother Language Day" to be observed on 21 February (www.unesco.org, 09.09.2024).

২০০২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ A/RES/56/262 of 2002 নং প্রস্তাবে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় এবং ২০০৭ সালের ১৬ই মে A/RES/61/266 নং প্রস্তাবে বিশ্বের মানুষের ব্যবহৃত ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রদানে এগিয়ে আসতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানায়। শুধু তাই নয়, উক্ত অধিবেশনে ২০০৮ সালকে 'আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ' ঘোষণা করে

(www.un.org, 09.09.2024)। এভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য ইউনেস্কোর ঘোষণার পর ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে এবং সুসমাচার এই যে আগামী বছর ইউনেস্কো যথাযোগ্য গুরুত্বসহকারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রজতজয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বৈশ্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষা চর্চা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের অবারিত সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলামের মতে, ''প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মাতৃভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের বাংলাভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নজিরবিহীন আত্মত্যাগের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি" ('আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' (https://bn.banglapedia.org 09.09.2024))।

বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিকাশের ইতিহাসে এ স্বীকৃতির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভারস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মান 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করে এবং এর প্রধান উদোক্তা ও প্রস্তাবক রফিকুল ইসলামকে ২০১৬ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানজনক বেসামরিক পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক'-এ ভূষিত করে। এর ধারাবাহিকতায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষার গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' ভবন নির্মাণ-কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পন্ন করা এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা এবং ইউনেস্কোর সদস্য দেশগুলির মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়া। এর মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা গবেষণায় নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এর মাধ্যমে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা চর্চারও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ২০১০ সালে প্রণীত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন। উক্ত আইনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর দায়িত্ব-তালিকার দুই নম্বরে আছে, ''পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এতদসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা'' (প্রথম আলো, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। একই বছর প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, যেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা যুক্ত হয়। এ নির্দেশনা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত চেতনারই প্রতিফলন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চার ধারা

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমাদের নিজস্ব হরফ আছে। চাকমাদের মাতৃভাষা-চর্চার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা ভাষা আন্দোলনের দশকে প্রথম নিজস্ব হরফে মাতৃভাষার পাঠ্যবই রচনা করে। এর আগে মূলত চাকমা ভেষজ চিকিৎসা তাল্লিক শাস্ত্র ও তন্ত্রমন্ত্রগুলো চাকমা হরফে লেখার চল ছিল। চাকমা লিপিকে রক্ষা করেছিলেন 'লুরি' বা রাউলি সম্প্রদায় আঘরতারা পাঠের মাধ্যমে। এবং এ লিপি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতেন চাকমা তান্ত্রিক ও বৈদ্যরা। রাউলিরা মৃতদেহ সৎকারে ধর্মীয় পূজা-অর্চনার সময় আঘরতারা থেকে বিশেষ বিশেষ সূত্র পাঠ করতেন। উল্লেখ্য, চাকমা চিকিৎসাশাস্ত্র বা 'তাল্লিক' চাকমা লিপিতে লেখা। বৈদ্য বা চিকিৎসকেরা এসব দেখে রোগীর শুভাশুভ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দিতেন। তান্ত্রিকেরা চাকমা লিপিতে তাদের তন্ত্রমন্ত্র ও দেহতত্ত্ব

সম্বন্ধীয় বিষয় লিখে রাখতেন। তাবিজ-কবজের জন্য বিশেষ 'আং' বা নকশা এবং বীজমন্ত্র এ লিপিতে লিখিত না হলে ফলদায়ক হতো না। বস্তুতপক্ষে চাকমা লিপিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এ সম্প্রদায়ের লোকেরাই। ব্রিটিশ আমল অবধি মোটামুটি এমনটিই ছিল চাকমাদের মাতৃভাষার বর্ণমালা চর্চার ধারা (খীসা, ১৯৮৭, পৃ. ৮-৯)। এককথায় চাকমাদের বর্ণশিক্ষার ধারাটি ছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরা, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়। ভাষা-গবেষক শুভ্রজ্যোতির অভিমত হলো, ''বর্ণশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ না থাকায় চাকমা বর্ণগুলির চর্চা কম ছিল। ফলে বর্ণগুলির কোনো উন্নতি সাধিত হয়নি, অধিকন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। অপরদিকে চাকমা বর্ণে লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র তথা তান্ত্রিক শাস্ত্রেও যে সকল পুঁথি বৈদ্যগণের কাছে থাকত, সেগুলি তারা জনসমক্ষে খোলা থেকে বিরত থাকত'' (চাকমা, ২০১৬, পৃ. ২০১)। শুভ্রজ্যোতির বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে চাকমা বর্ণশিক্ষা পদ্ধতি শুধু বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, সাধারণের মাঝে বর্ণশিক্ষার সুযোগ অবারিত ছিল না এবং এরজন্য কোনো সামাজিক উদ্যোগও ছিল না। ব্রিটিশ আমলের শেষ দশকে ১৯৪০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা সুপারিনটেন্ডেন্ট এইচ এফ মিলারের নির্দেশনায় প্রথম বাংলা হরফে চাকমা ভাষা শেখার সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর জন্য CHAKMA PRIMER নামে একটি বইও ছাপানো হয়। কিন্তু তৎকালীন নেতৃস্থানীয় চাকমারা এ উদ্যোগকে সাদরে গ্রহণ করেনি। ফলে বাংলা হরফে চাকমা ভাষা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটি আর অগ্রসর হয়নি।

পূর্ব-বাংলায় ভাষা আন্দোলনের পর সাধারণ চাকমাদের মধ্যেও মাতৃভাষায় সাক্ষরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এক্ষেত্রে প্রবাদপ্রতিম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন নোয়ারাম চাকমা। তিনি বহু কষ্ট, শ্রম ও সাধনায় চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা শেখার সুবিধার্থে 'চাকমার পথম শিক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের সদয় অনুমতিক্রমে এবং চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকাসহ এটি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পুস্তকাকারে চাকমা হরফ সংকলন প্রকাশের পিছনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ কৌতূহল-উদ্দীপক। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

> বহু বছর ধরে আমরা যে রত্নের অভাবে বিশ্বের দরবারে কাঙ্গাল হয়ে আছি, যার অভাবে আমরা আমাদের জাতিত্বও হারাতে বসেছি সেই হারানো রত্নোদ্ধারের জন্য সুদীর্ঘ বারো বছরের পরিশ্রমের ফল 'চাকমার পথম শিক্ষা' বইটি আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম। জানি পুস্তকটিতে চাক্‌মার ভাষা শিক্ষা করবার জন্য খুব সামান্যই তথ্য পাবেন। আশা ছিল অনেক কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পুস্তকটির কলেবর ক্ষুদ্র করতে বাধ্য হয়েছি। আমি নিজেও (সফলকাম) হতে পারিনি কিন্তু এটা আমার প্রথম প্রচেষ্টা মনে রেখে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি। (চাকমা, ১৯৫৯)

উপরের উদ্ধৃতিটিতে নোয়ারাম চাকমার মাতৃভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট। নিঃসন্দেহে তাঁর এ উদ্যোগটি ছিল দূরদর্শী ও যুগান্তকারী। তিনি চাকমা ভাষা লিখন-পদ্ধতির উন্নয়নে প্রথম চিন্তক। অক্ষরগুলোকে একটি ফরম্যাটে এনে বর্ণমালা শেখার উপযোগী করে সংকলন করার সুদূরপ্রসারী চিন্তাটি তাঁরই। তাঁর সংগৃহীত চাকমা বর্ণমালা বইটি তৎকালীন 'পূর্ব-পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড' পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডেপুটি কমিশনার এম এ করিম মহোদয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। সমকালীন চাকমা কবি সলীল রায় রচিত 'নুয়ারাম– তর নাঙে'

শীর্ষক কবিতার নিচের দুটি পঙ্‌ক্তিতে নোয়ারাম চাকমা কর্তৃক 'চাকমার পত্থম শিক্ষা' সংকলন ও প্রকাশের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়:

নু'য়ারাম, ত'র স্ববন ম'ইত্তুন আরো গভীরত–? চাঙমা লেখার রূপ তুলি ধরি ছাবা-অক্ষরত,
লিঘিলে 'পত্থম শিক্ষা', আঝা তর – এ অক্ষর লোই,/ চাঙমা অক্ষরে বই একদিন্যা গরি উধিবোই।
[নোয়ারাম, তোমার স্বপ্ন ছিল আমার স্বপ্নের চেয়ে গভীরে –/চাকমা লিপিরূপ প্রকাশিলে তুমি ছাপা অক্ষরে –
লিখেছ তুমি 'পত্থম শিক্ষা' আশা ছিল তোমার– এ হরফে নিয়ে, লেখা হবে একদিন চাঙমা ভাষা গ্রন্থমালা।]

নোয়ারাম চাকমার পর হরকিশোর চাকমাও 'চাকমা লেখা শিক্ষা' নামে একটি বর্ণশিক্ষার বই প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯০৩ সালে স্যার গ্রিয়ারসন কর্তৃক মুদ্রিত এবং নোয়ারাম চাকমা সংগৃহীত ও মুদ্রিত বর্ণগুলোর সাথে হরকিশোরের বর্ণগুলোর আকৃতি, সংখ্যা ও বিন্যাসে গরমিল থাকায় মনে হয় তখন তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। অর্থাৎ তাদের মাতৃভাষা চিন্তা ও কর্মগুলো মহৎ হলেও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষার উদ্যোগ সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। এর কয়েক বছরের মধ্যে কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবে চাকমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যুগ। হঠাৎ জমে ওঠা কাপ্তাই হ্রদের জলে ডুবে যায় রাঙ্গামাটির বিস্তীর্ণ জনপদ। লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি সহায়সম্বল হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে ষাটের দশক থেকে একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না আসা পর্যন্ত চাকমাদের মাতৃভাষা-চর্চায় কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

স্বাধীনতার পর শিক্ষিত তরুণ ছাত্রসমাজ মাতৃভাষা চর্চায় উদ্যোগী হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাহাড়ি ছাত্ররা এবং রাঙ্গামাটির তরুণ ছাত্রসমাজ মাতৃভাষা-চর্চার উদ্দেশ্যে গঠন করে বিভিন্ন সংগঠন। ১৯৭২ সালে গঠিত হয় 'জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর' (জুভাপ্রদ)। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত *জুভাপ্রদ* মাতৃভাষায় চাকমাদের প্রধান সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব বিজু উপলক্ষ্যে ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। উক্ত ম্যাগাজিনগুলোতে চাকমা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা হতো। তবে সেগুলো বাংলা হরফে লেখা হতো। ১৯৮১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি কিছু তরুণ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চর্চা ও সংরক্ষণের প্রয়াসে 'রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল' (রাক) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এটি পরে নাম পরিবর্তন করে 'জুম ঈসথেটিক কাউন্সিল' নাম ধারণ করে। যা '*জাক*' নামে সমধিক পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় এ সংগঠনটি বিগত চল্লিশ বছর ধরে নিয়মিত সংকলন প্রকাশ করছে। *জাক*ই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন, যারা বিরামহীনভাবে দীর্ঘ চার দশক ধরে বিভিন্নভাষী নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে মননশীল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৮৭ সালে 'জুম ঈসথেটিক কাউন্সিল' কর্তৃক চাকমা বর্ণমালা বিষয়ক পত্রিকা '*দিকপাদা*' প্রকাশিত হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে থেমে যায় '*দিকপাদা*' পত্রিকার প্রকাশনা। শান্তিচুক্তির পর জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালে জাক '*দিকপাদা-২*' ও '*দিকপাদা-৩*' সংখ্যা প্রকাশ করে। এরমধ্যে সংগঠনটি 'আনন্দ মাল্টিমিডিয়া'র কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় চাকমা বর্ণমালা ফন্ট 'বিজয় চাঙমা' তৈরি করে। সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে পাহাড়ের নৃ-গোষ্ঠীগুলোর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় ১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে

'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার পর। ১৯৮২ সালে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও গবেষক অশোক কুমার দেওয়ানের সম্পাদনায় চাকমা ভাষা শিক্ষা কোর্সের প্রথম পাঠ্যবই প্রকাশ করা হয়। এবং এ বইয়ের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট স্বল্পমেয়াদি চাকমা ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। কিন্তু চাকমা বর্ণ ও সংখ্যা, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, বানান, উচ্চারণ ও পঠনরীতিতে অসঙ্গতি ও অসমাঞ্জস্য থাকায় রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের কার্যনির্বাহী পরিষদের উদ্যোগে ২০০০ সালের ২৩শে আগস্ট চাকমা বর্ণমালা শিক্ষাদানের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ডা. ভগদত্ত খীসা। তাঁর নেতৃত্বে ২০০১ সালে 'চাঙমা পথম পাঠ' [ইংরেজিতে CHAKMA PRIMER] নামে চাকমা বর্ণশিক্ষার একটি মানসম্মত পুস্তক প্রকাশিত হয়। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগে চাকমাদের মাতৃভাষা-চর্চার নতুন ধারা শুরু হয়।

চাকমা ব্যতীত অন্য জাতিসত্তার মধ্যেও মাতৃভাষা-চর্চার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মারমা সমাজে নিজস্ব বর্ণমালার ব্যবহার বেশ প্রাচীন। মারমা লিপির উৎপত্তি উপমহাদেশের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে। বর্তমানে মারমা লিপিতে বর্ণ-সংখ্যা মোট ৪৫টি। তন্মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩টি আর স্বরবর্ণ ১২টি। এ বর্ণমালা বার্মিজ বা রাখাইন বর্ণমালা নামেও পরিচিত। বহুকাল আগে থেকেই মারমারা তাদের বর্ণমালা রাজকার্য ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লেখার কাজে ব্যবহার করে আসছেন। মারমা বর্ণমালায় মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থও আছে। প্রফেসর মংসানু লিখেছেন, মারমাদের নিজস্ব হরফে 'পী' [তাল জাতীয়] পাতায় কিংবা বিশেষ ধরনের তৈরি করা হলুদ রঙা কাগজে বনজ গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরি করা অমোচনীয় কালিতে হাতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য পুথি-পুস্তক রয়েছে। এসব পুস্তকে রয়েছে ঋতু পরিবর্তনের সাথে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের চিত্তাকর্ষক কাব্যিক বর্ণনা, বিভিন্ন গল্প ও রূপকথার মনোমুগ্ধকর কাহিনি, লোকনীতি, লোকাচার, পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইন, বনজ ঔষধ সম্পর্কীয় বিষয় ও ধর্মীয় পুস্তক (মং সানু, ২০১৮ পৃ. ১৯৪)। অনেক ক্ষেত্রে দেব-দেবীর পূজার শ্লোক মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ/মাদুলি-লিখন ইত্যাদি কাজে এ বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় (উ চ নু, ২০০৭, পৃ. ১৫০-১৫১)। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগে মারমাদের মাতৃভাষা আধুনিক শিক্ষাক্রমভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাহন হয়ে ওঠেনি।

বান্দরবানের ম্রো জাতিসত্তা ভাষাচর্চায় খুবই সক্রিয়। তারা মুরং নামে সমধিক পরিচিত। ম্রোরা নিজেদেরকে 'ম্রো-চা' বলে। এর অর্থ মানব-সন্তান। ম্রোদের মাতৃভাষা-চর্চার ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। এককালে ম্রোদের কোনো নিজস্ব বর্ণমালা ছিল না। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে যে, ভাষাকে সঠিকভাবে প্রকাশের জন্য বর্ণমালার বিকল্প নেই। অক্ষর ছাড়া ভাষাকে জীবিত রাখা সম্ভব নয়। মাতৃভাষা চর্চার জন্য নিজস্ব লিপি ও বর্ণমালার একান্ত প্রয়োজন। ম্রোদের কিংবদন্তি পুরুষ ও মহাসাধক মেনলে ম্রো (ক্রামাদি) ম্রো বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন ১৯৮৪-৮৫ সালে। তাঁর উদ্ভাবিত বর্ণমালায় মোট ৩১টি বর্ণ রয়েছে। ম্রোদের বর্ণমালার সাথে রোমান, শ্যাম, বর্মি ও চৈনিক বর্ণমালার কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ম্রো কবি ও লেখক সিং ইয়ং ম্রো লিখেছেন:

> ১৯৮৫ সালে ২৫ আগস্টের রবিবার দিনটি ছিল ম্রো জাতির এক ঐতিহাসিক দিন। এ দিনে পোড়া পাড়ায় (মেনলের নিজস্ব গ্রাম) প্রায় ৫ হাজার ম্রো উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং সেদিন ৫ হাজার লোকের উপস্থিতিতে তাঁর আবিষ্কৃত বর্ণমালা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করে পাঠ করলেন। তখন ৫ হাজার লোক আনন্দে উৎফুল্লে অভিবাদন জানিয়ে চিৎকার ও করতালির মাধ্যমে মেনলে ম্রো এর বর্ণমালা গ্রহণ করলো। তাঁর আবিষ্কৃত বর্ণমালা গ্রন্থ গ্রহণ করবে তা তিনি বুঝতে

পারেননি। তাই তিনি জনগণের উৎফুল্লতা দেখে আনন্দে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।' (ম্রো, ২০০৫, পৃ. ৬৮-৮১)

১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসে আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশে চলে যান মেনলে ম্রো। যাবার আগে তাঁর অনুসারী শিষ্যদের মাঝে ভাষা ও বর্ণমালা, তাঁর প্রববর্তিত ক্রামা ধর্মের পাণ্ডুলিপি, সামাজিক নীতিমালা, চিকিৎসা-সেবার জন্য নিজ হস্তে ম্রো ভাষা ও বর্ণমালায় লিখিত সকল পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করে যান এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও দিয়ে যান। এরপর তাঁর অনুসারীরা ১৯৮৬ সালে পোড়া পাড়ায় 'ম্রোচ চা সাংরা' অর্থাৎ ম্রো ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। ম্রো ভাষা ও বর্ণমালার উপর অধিকতর গবেষণা, প্রকাশনাসহ অনুশীলন-কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ১৮ই জানুয়ারি গঠিত হয় 'ম্রো ভাষা বর্ণমালা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটি'। ১১ সদস্য-বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ভাষা-কমিটির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে গঠিত হয় উপজেলাভিত্তিক উপ-কমিটি। ১৯৯৬ সালে ১২ই ডিসেম্বর মেনরুম ম্রো তথ্য-প্রযুক্তির এ বিশ্বে ম্রো ভাষার বর্ণমালাকে প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি উদ্ভাবন করলেন *রিয়েন* নামে ম্রো ভাষার একটি ফন্ট। ম্রো ভাষা ও বর্ণমালাকে তিনি আধুনিক বিশ্বের সামনে উপস্থাপনে সক্ষম হন। ম্রোরা বর্তমানে নিজ ভাষায় শতকরা ৬০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জন করেছে (ম্রো, ২০১৯, পৃ. ১১০)।

২০০০ সাল থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠান তথা বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ম্রো শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স' চালু করে। এতে ম্রোদের ভাষা-শিক্ষার চেতনা আরো সুদৃঢ় হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিক্ষক মেনয়াং ম্রো। তিনি ম্রো ভাষা (অক্ষরজ্ঞান) প্রশিক্ষণের জন্য 'ম্রোচা চাসাংওয়ান' অর্থাৎ 'ম্রো প্রাইমার' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার আলোকে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষরজ্ঞান) পরিচালনা করছে। ২০০৫ সাল থেকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ম্রো ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বান্দরবান জেলার সাতটি উপজেলায় মোট ৩৫টি গ্রামে গণপাঠশালা নামে ম্রো ভাষায় স্কুল পরিচালনা করে। ম্রো শিশুরা এ গণপাঠশালাগুলোতে শিশু শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়ালেখার সুযোগ লাভ করে। প্রায় ১০০০ ম্রো ছেলে-মেয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে ম্রো ভাষায় শিক্ষা লাভ করে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত করে। ফলে এ বিদ্যালয়গুলো থেকে পড়াশুনা করে অনেক শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে ইউএনডিপি-চিএইচটিডিএফ-এর অর্থায়নে 'তৈমু' ২০০৮-০৯ সালে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেশন-এর মাধ্যমে থানচি উপজেলায় ৫টি ম্রো গ্রামে ম্রো ভাষা বিদ্যালয় পরিচালনা করে। বর্তমানে ম্রোদের উন্নয়ন সংস্থা 'ম্রোচেট' বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, থানচি, রুমা ও আলীকদম উপজেলায় ৪৫টি ম্রো গ্রামে ম্রো ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ আওতায় ১৫০০ জন ম্রো শিক্ষার্থী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে (ম্রো, ২০২৪, পৃ. ১১১)।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চার ধারা

চাকমা জাতিসত্তার মাতৃভাষা উদ্যোগ

১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতিলাভের ঘটনায় পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে মাতৃভাষা-চর্চার নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়। এবারেও তরুণ ছাত্রসমাজ এগিয়ে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে অবস্থানকালে কয়েকজন চাকমা তরুণ ছাত্রযুবক মিলে ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি গঠন করে 'চাকমা সাহিত্য বাহ' বা

'চাকমা সাহিত্য কেন্দ্র'। এর অন্যতম উদ্যোক্তা বাবু দেবপ্রিয় চাকমার নিকট থেকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে 'বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র'র আলোকে নবগঠিত সংগঠনটির নামকরণ করা হয়েছে 'চাকমা সাহিত্য বাহ' এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. চাকমা ভাষা ও বর্ণমালার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও গবেষণা।
২. চাকমা ভাষায় লিখিত কবিতার বই, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি মুদ্রণ তথা প্রকাশ করা।
৩. চাকমা লোকসাহিত্য (রূপকথা, কিংবদন্তি, ধাঁধা, পালা, প্রবচন ইত্যাদি) সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা।
৪. চাকমা জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা।
৫. চাকমা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির নান্দনিক চর্চা এবং বিকাশ ঘটানো।
৬. ভাষা-সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা।
৭. চাকমা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, পাঠচক্র ও বইমেলার আয়োজন করা।
৮. বিদেশি বা অন্যভাষায় লিখিত বিখ্যাত বই চাকমা ভাষায় এবং চাকমা ভাষার বই বিদেশি বা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা।
৯. চাকমা একাডেমি প্রতিষ্ঠা ও চাকমা আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলোর মাধ্যমে নিজেদের মাতৃভাষা সম্পর্কে চাকমা তরুণদের গঠনমূলক চিন্তাচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'চাকমা সাহিত্য বাহ'র উদ্যোগে ২০০৪ সাল থেকে চাকমা ভাষা লেখার প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ঢাকা ট্রাইবাল হোস্টেলে প্রশিক্ষণ-কোর্সের উদ্‌বোধন করেন তৎকালীন মাননীয় উপমন্ত্রী বাবু মণি স্বপন দেওয়ান এমপি (*ভোরের কাগজ*, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৪)। সংগঠনটি চাকমা ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে নিজস্ব হরফ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়। কারণ, চাকমা লিপি হচ্ছে চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল স্মারক। তাছাড়া চাকমা ভাষাটি বাংলা বা রোমান হরফে লিখতে গেলে ভাষিক স্বকীয়তার বিচ্যুতি ঘটে। এ কারণে 'চাকমা সাহিত্য বাহ'র প্রথম কর্মসূচি ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষিত তরুণদের চাকমা বর্ণমালার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান। 'চাকমা সাহিত্য বাহ' মাতৃভাষা শেখা ও শেখানোর কাজটি সফল করার জন্য বই-সংরক্ষণ, লিখন ও মুদ্রণের দিকেও দৃষ্টি দেয়। সংগঠনের উদ্যোগে খাগড়াছড়িতে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ইনজেব চাকমাদের পরিচালিত খাগড়াছড়ির নোয়ারাম সাহিত্য সংসদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চাকমা ভাষা শিখানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংগঠনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ২৪৩টি সেন্টারে ২৫৬টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ১৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা লেখার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় (চাকমা, ৩০শে জুন, ২০২৪)।

হাতে-কলমে মাতৃভাষা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি চাকমা তরুণরা তাদের মাতৃভাষার ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তিকীকরণেও বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। প্রতিশ্রুতিশীল চাকমা বর্ণমালা-গবেষক বিভূতি চাকমা ও জ্যোতি চাকমার নিরলস ও অদম্য প্রচেষ্টায় চাকমা বর্ণমালা লেখার 'রিবেং ইউনি' কি-বোর্ড উদ্ভাবিত হয়েছে। তাদের উদ্ভাবিত সফটওয়ার ব্যবহার করে এখন কম্পিউটার এবং স্মার্টফোনে

চাকমা ভাষা লেখা যায়। চাকমা ভাষা গুগলে ব্যবহারের জন্য ইউনেস্কোর অনুমোদনও তারা পেয়েছে। এভাবে চাকমাদের মাতৃভাষা-চর্চায় আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। জ্যোতি চাকমার নিচের বক্তব্য থেকে চাকমা বর্ণমালার ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কে তাঁদের ভাবনাগুলো বোঝা যায়:

> চর্চার অভাবে আজ আমাদের ঐতিহ্যবাহী চাকমা বর্ণমালা নিভু নিভুভাবে কোনো রকমে বেঁচে রয়েছে। তবে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে শুধু বর্ণমালার সাথে পরিচিতি এবং চর্চা থাকলেও সেই বর্ণমালা দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে বর্ণমালাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করতে এবং টিকিয়ে রাখার জন্য বর্ণমালাকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন। নচেৎ তা হারিয়ে যাওয়ার পথে ধাবিত হবে। এ অনুধাবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চাকমা বর্ণমালার ইউনিকোড ফন্ট তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম। ইউনিকোড ফন্ট তৈরি করা গেলে চাকমা বর্ণমালা আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে যুক্ত হবে। আজ আমরা নিজেকে গর্বিত বোধ করছি এজন্য যে, আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চাকমা বর্ণমালা আজ ইউনিকোডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (জ্যোতি, ২০১৩, পৃ. ১৪৮)।

আরেকজন অদম্য তরুণ চাকমা মাতৃভাষা প্রেমিক বিভূতি চাকমা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাকমা বর্ণমালাগুলোর উন্নয়ন-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর চাকমা বর্ণমালার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কর্মপ্রয়াসকে একটি বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বিভূতি চাকমা ২০১৮ সালে 'প্রযুক্তিতে চাকমা ভাষার উন্নয়ন' শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে চাকমা বর্ণমালা কি-বোর্ড বা ইউনিকোড উদ্ভাবন এবং কম্পিউটার ও স্মার্টফোনে তা প্রয়োগের দীর্ঘ ও বহুমুখী প্রক্রিয়া তুলে ধরেন। নিজের বই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে:

> চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানসহ এ ভাষাকে তথ্য-প্রযুক্তিতে যুক্ত করার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র উদ্যোগ।' মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর অনভূতি খুবই আবেগমথিত: 'মায়ের ভাষার মত মধুর ভাষা এ পৃথিবীতে আর কোন ভাষা নেই। ভাষাপ্রেমিক মাত্রই তা উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারবেন। চাকমা আমাদের মায়ের ভাষা ও প্রাণের ভাষা। দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম যে ভাষায় মা বলে ডেকেছি। নিজের মাতৃভাষাকে ভুলে যাওয়া আমাদের মোটেও কাম্য নয় (চাকমা, ২০১৮, প্রসঙ্গ কথা)।

এভাবে একুশ শতকের সূচনালগ্নে চাকমা তরুণ প্রজন্ম মাতৃভাষার প্রতীক বর্ণমালার উন্নয়ন ও শিক্ষাদানের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এটা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা, সমর্থন ও সহযোগিতা পেলে এই তরুণ প্রজন্ম মাতৃভাষার উন্নয়নে আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চা

ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা ককবরক। তাদের নিজস্ব হরফ নেই। ২০০০ সাল পর্যন্ত তারা বাংলা হরফে মাতৃভাষা চর্চা করতো। খুশিকৃষ্ণ ত্রিপুরা তাদের মাতৃভাষা-চর্চার পথিকৃৎ। এরপর সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও প্রভাংশু ত্রিপুরা বাংলাভাষায় ত্রিপুরা ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখালেখি করেন। নারীদের মধ্যে শোভারাণী ত্রিপুরা সাহিত্যচর্চায় সুনাম কুড়িয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের স্বজাতীয় ত্রিপুরাদের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীও এখন রোমান হরফে মাতৃভাষা চর্চা করছে। তবে বাংলা হরফেও কেউ

কেউ ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বহুভাষিক শিক্ষা-গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার বক্তব্য হলো:

> ২০০০ সালে ভারতে একটি ওয়ার্কশপ হয়, সেখানে বাংলাদেশে থাকা ত্রিপুরাদেরও ডাকা হয়েছিল। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী আছি, তাদের কিছু মানুষ সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মূলত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের যেহেতু নিজস্ব হরফ নেই, নতুন করে হরফ বানাতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে। প্রস্তাব আসে যে বাংলা বা রোমান যে-হরফে আমরা লিখতে পারি, সে-হরফেই আমরা নিজেদের ভাষা লিখবো। তবে আমরা অফিসিয়ালি লিখলে রোমান হরফেই লিখব বলে সিদ্ধান্ত হয়' (বিডি নিউজ ২৪ ডটকম, ১৯ অক্টোবর, ২০২২)।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা, মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, জগদীশ রোয়াজা, প্রশান্ত ত্রিপুরা, মুকুল কান্তি ত্রিপুরাসহ অনেকেই ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চা ও উন্নয়নে কাজ করছেন। তারা মাতৃভাষায় ছড়া, কবিতা, গান, নাটক রচনার পাশাপাশি রূপকথাগুলো গ্রন্থিত করার কাজে যুক্ত আছেন। এর মধ্যে ককবরক ভাষার উন্নয়নে মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার ভূমিকা বেশ প্রশংসনীয়। তিনি ২০০২ সালে নিজ উদ্যোগে স্বলিখিত প্রথম বই *ককবরক শব্দ ভান্ডার* প্রকাশ করেন। এটি মূলত বাংলা ও ইংরেজি শব্দার্থসহ ককবরক শব্দমালার বই। বইটির উপযোগিতা ও চাহিদা বিবেচনা করে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ২০১১ সালে বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে তরুণ লেখকের জন্য এটি একটি বড়ো অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা। এরপর দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি 'জাবারাং কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে ত্রিপুরাসহ আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষার উপযোগী বই প্রণয়নের কাজে হাত দেন। ২০০৬ সালে 'জাবারাং কল্যাণ সমিতি' চাকমা, মারমা ও ককবরক (ত্রিপুরা) ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। 'সেভ দ্য চিলড্রেন'র অর্থায়নে এ কার্যক্রম পরে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এর জন্য ২০০৭ সালে মুখরা বিকাশ ত্রিপুরা ককবরক ভাষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। কারিতাস বাংলাদেশ-এর প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় উক্ত বইগুলো প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, মথুরা বিকাশ ত্রিপুরাসহ কিছু মাতৃভাষাপ্রেমী তরুণ তাদের নিজ ভাষা ককবরক প্রমিতকরণ, ককবরক বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ককবরকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২০০৮ সালে 'ককবরক রিসার্চ ইনস্টিটিউট' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন (ত্রিপুরা, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)।

২০১৭ সাল থেকে সরকারি উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ শুরু হলে ত্রিপুরাদের ককবরক চর্চায় নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে গঠিত ভাষাভিত্তিক লেখক প্যানেলে 'ককবরক ভাষা'র দলনেতা হিসেবে মনোনীত হন। বাংলাদেশ সরকারের আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও উপকরণ তৈরির কাজ সম্পাদন করছেন একদল লেখক, গবেষক ও শিক্ষক। মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা, অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা, সত্যহা পানজি ও জগদীশ রোয়াজার উন্নয়ন ও অভিযোজনে ২০১৬ সালে মুদ্রিত হয়েছে ককবরক ভাষায় রোমান হরফে রচিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বই 'ANI BIJAP' বা 'আমার বই'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকসহ প্রয়োজনীয় শিখনসামগ্রী

উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নেয় ২০১৪ সালে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান পাঠ্যবইয়ের ভূমিকায় আদিবাসী ভাষাভাষী লেখকদের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছে:

> স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা যেন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের প্রতিটি বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে পারে এবং গর্ববোধ করতে পারে– প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই কাজটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্ব স্ব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর শিক্ষক ও পণ্ডিতজনদের নিয়ে উন্নয়ন ও অভিযোজনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। যে শ্রম, মেধা ও নিষ্ঠাসহকারে তারা এই মহৎ উদ্যোগটি সম্পন্ন করেছেন, তার তুলনা চলে না।

মারমাদের মাতৃভাষা চর্চার অগ্রগতি

মারমাদের নিজস্ব হরফ আছে। তারাও মাতৃভাষা চর্চা করছে। স্মরণাতীতকাল থেকে তাদের মধ্যে ক্যাং বা বিহার-ভিত্তিক মারমা বর্ণমালা চর্চার চল ছিল। তবে আগে তাদের মাতৃভাষাভিত্তিক কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। 'বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল' মারমা ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। একুশ শতকের শুরুতে সংগঠনের উদ্যোগে বান্দরবান সদরের উজানি পাড়ায় মারমা শিক্ষার্থীদের জন্য মারমা ভাষা ও বর্ণমালা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় উদ্যোগটি আর অগ্রসর হয়নি। মারমা বুদ্ধিজীবীদের মতে, চর্চার অভাবে মারমা ভাষা ও বর্ণমালা এখনো বিপন্নতার বিপদ কাঠিয়ে উঠতে পারেনি। আশার কথা হলো, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কল্যাণে মারমা ভাষা-শিক্ষার একটি ক্ষীণ ধারা বহমান আছে। ২০০২ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) মারমা শিশুদের মারমা ভাষা ও বর্ণমালার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিশুদের উপযোগী করে একটি বর্ণমালা-পরিচিতি প্রকাশ করে। এটি ছিল প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের উপযোগী পাঠ্যবই (মারমা, ২০১১, পৃ. ৮-১৬)। এ পুস্তিকায় মারমা শব্দভান্ডারের পাশাপাশি বাংলা শব্দার্থও রাখা হয়েছে। কিন্তু শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে উচ্চারণ বিভ্রাট ধরা পড়ে। এমন বাস্তবতায় ২০০৫ সালে কারিতাস-আইসিডিপি-সিএইচটি প্রকল্পের আওতায় 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আদিবাসী শিশুদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টি বেশ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। এ লক্ষ্যে কারিতাস মারমা, চাকমা ও ত্রিপুরা ভাষায় পাঠ্যবই প্রকাশ করেছে এবং ৩০টি শিক্ষাকেন্দ্রে সম্প্রদায়ভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় মারমা শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করা হয় (মারমা, ২০১১, পৃ. ৮-১৬)। এ পুস্তকগুলো আধুনিক ভাষা-শিক্ষার পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে প্রণীত হওয়ায় এবং বিষয়বস্তুতে মারমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ছড়া, গল্প, কবিতা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মানসম্মত বলে বিবেচিত হয় এবং মারমা সমাজেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। একইসময় উন্নয়ন সংস্থা সিসিডিপি এবং জাতীয় পর্যায়ের এক এনজিও যথাক্রমে ২০০৫ ও ২০০৬ সালে মারমা শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠ্যবই প্রকাশ করে। অতঃপর ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ কর্তৃক সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে ও এসআইএল (সিল)-এর সহযোগিতায় পার্বত্যাঞ্চলের মারমা শিশুদের জন্য মারমা হরফে ২০০৯ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়। ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ পরিচালিত ১০০টি মারমা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে উক্ত পাঠ্যবই সরবরাহ ও পাঠদানের ব্যবস্থা হয় (মারমা, ২০১১, পৃ. ১৬)। উক্ত স্কুলগুলো বর্তমানে পার্বত্য জেলা পরিষদের

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এরপরেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করে। মারমা জনগোষ্ঠীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এনসিটিবির নির্দেশনায় গঠিত হয় মারমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার লেখকদল। তিন পার্বত্য জেলা থেকেই মারমা ভাষায় দক্ষ লেখকবৃন্দ এ বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত হন। খাগড়াছড়ি থেকে ডা. অংক্যজাই মারমা, হ্লাসিংথোয়াই মারমা, থোয়াইউ মগ, রাঙ্গামাটি থেকে উ উইনমং জলি (জলি মং), বান্দরবান থেকে উচিমং মারমাসহ শৈফোচিং মারমা, মংখ্যইচিং মারমা প্রমুখ। তাদের মেধা, দক্ষতা ও নিষ্ঠায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে 'আমার বই', 'এসো লিখতে শিখি' ও নানা গল্পের বই মুদ্রিত হয়েছে।

সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষিত তরুণ মারমারাও আপন ভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও শিক্ষাদান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মারমাদের মাতৃভাষা বিষয়ক ভাবনা খুবই চিত্তাকর্ষক এবং আশাপ্রদ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী খুব প্রাঞ্জল ভাষায় মাতৃভাষা-চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে:

> মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি মানুষের চির শ্রদ্ধার বস্তু। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি আর ম্রাইমা (মারমা) আমাদের মাতৃভাষা। মায়ের সাথে আমাদের যেমন নাড়ির যোগ, ভাষার সঙ্গে তেমনি প্রাণের যোগ। ম্রাইমা ভাষা আমাদের ঐতিহ্যের বাহন ও চেতনার ধারক। এ ভাষাতে আমরা প্রথম কথা শিখি, লিখন শিখি, গান করি, সর্বোপরি ভাবের আদান-প্রদান করি। এই ভাষার প্রতিটি শব্দই আমাদের প্রিয় (ম্রাসাজাই, ২০১১, পৃ. ৩৪)।

মাতৃভাষার লেখ্যরূপ নিয়ে সচেতন ও মাতৃভাষাপ্রেমী মারমা তরুণ সমাজ এগিয়ে আসলে মারমা ভাষা ধীরে ধীরে বিকশিত হবে। তরুণদের মধ্যে বিভিন্ন লিটন ম্যাগাজিন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্মরণিকা ও স্মারকগ্রন্থে এখনো মারমা অক্ষরে প্রবন্ধ, কবিতা, গান, গল্প রচনার চেষ্টা ও উৎসাহ দেখা যায়। অন্যদিকে মারমা ভাষা ও বর্ণমালাকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন থোয়াইউ মগ। তিনি খাগড়াছড়ির একজন ফ্রিল্যান্সার ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার। থোয়াইউ ২০১৬ সালে 'আমার মারমা স্কুল' নামে মারমা বর্ণমালা শেখার অ্যানিমেশন ও শিশুতোষ গল্পের বই তৈরি করে কার্টুনের মাধ্যমে মারমা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি লিখন পদ্ধতিকে আরো সহজ করে শেখার ব্যবস্থা করায় মারমা শিশুরা ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে পড়ছে আমার মারমা স্কুলে (চ্যানেল আই, ২০২৪)। এর মধ্য দিয়ে মারমা মাতৃভাষা অধ্যয়ন ও লিখন ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে।

বমদের মাতৃভাষা ও বর্ণমালা চর্চা

বর্তমান বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি এবং বান্দরবান সদর থানা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৭০টি গ্রামে বমরা বসবাস করে। বম সোশ্যাল কাউন্সিল, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে পরিচালিত জরিপ অনুসারে বম জনসংখ্যা ৯৫০০। ২০২২ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বম জনসংখ্যা ১৩, ১৯৩ জন। বম জনগোষ্ঠীর শতভাগ খ্রিষ্টান। বমদেরও নিজস্ব মাতৃভাষা আছে। কিন্তু খ্রিষ্টান মিশনারিদের আগমনের আগ পর্যন্ত বম, পাংখোয়া, লুসাই তথা মিজো বা জোদের ভাষায় কোনো বর্ণমালা ছিল না। রেভারেন্ড জে এইচ লোরেইন এবং রেভারেন্ড টি ডব্লিউ স্যাভিজ খ্রিষ্টান মিশনারিদ্বয় মিজোরামের আইজলে আসেন ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। তারা রোমান স্ক্রিপ্ট অনুসরণে বর্ণমালা

প্রবর্তন করেন। তা দিয়ে বাইবেলের অংশ, ধর্মীয় শিক্ষার পুস্তিকা, অভিধান ইত্যাদি বের করেন। ১৯১৮ সালের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বম পাংখোয়ারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ শুরু করে। তখন থেকে তারা রোমান বর্ণমালার অনুকরণে প্রণীত বর্ণমালার ব্যবহার শুরু করে। বমরা এ হরফ দিয়ে নিজস্ব ভাষায় পবিত্র বাইবেল অনুবাদ করে। বাইবেল ছাড়াও ধর্মীয় সংগীত, বাইবেলের ব্যাখ্যাসহ ধর্মীয় পুস্তিকা এবং অন্য বেশ কয়েকটি বই-পুস্তক বম ভাষায় রচিত হয়। বম ছাত্র সংগঠন 'বম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' বম ভাষায় *মেনরিহয়* নামে বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। বর্ণমালা পরিচিতি প্রাথমিক বই (Bawm Primer) পারিবারিক, সামাজিক উদ্যোগে অথবা গির্জার উদ্যোগে পড়ানো হয়। এভাবে বমদের মধ্যে মাতৃভাষা চেতনা পোক্ত হয় এবং মাতৃভাষায় স্বাক্ষরতার হার শতকরা আশি ভাগে উন্নীত হয়। তারা চিঠিপত্র, লেনদেন, হিসাবপত্র, সভাসমিতির কার্য-বিবরণী, নথিপত্র তথা সার্বিক সামাজিক তথ্য আদান-প্রদান বম ভাষায় সম্পাদন করে (সাহু, ২০০৪, পৃ. ১৬-২৪)। সম্প্রতি বম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেএনএফ-এর কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ফলে তাদের মাতৃভাষার সাম্প্রতিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

খিয়াংদের মাতৃভাষা চর্চা

পার্বত্য চট্টগ্রামের খুবই সংখ্যাল্প একটি নৃ-গোষ্ঠী হলো খিয়াং। বর্তমানে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় তাদের জনসংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। কিন্তু তারাও বহুযুগ ধরে পার্বত্য অঞ্চলে অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর সাথে বসবাস করে আসছে। খিয়াংরা সংখ্যায়ও কম, আবার বিভিন্নভাবে পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু দেশের নাগরিক এবং মানুষ হিসেবে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকার ও বিকশিত হওয়ার অধিকার তাদের আছে। খিয়াংরা মনে করে মাতৃভাষা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার মূল্যবান দান। তাদের মাতৃভাষা কুকি-চীন পরিবারভুক্ত। এজন্য বোধ হয় পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারে খিয়াংরা অশো-চীন বা লাইতু-চীন নামে পরিচিত। তবে মাতৃভাষা থাকলেও তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত হরফ বা বর্ণমালা নেই। তারাও রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে। খিয়াং ভাষায় প্রারম্ভিক ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকজন লেখক এগিয়ে আসেন। তারা হলেন আর টি মাউয়ি ছাকছেউক, ইভান ডলিয়াং, ইভান সইলাহ, উপা সাইমন এবং উপা সাজেই। ১৯৯৯ সালে ' Khyang Primer' শিরোনামে বইটি প্রকাশ করে খ্রিষ্টিয়ান ফেলোশিপ অব বাংলাদেশ। কিন্তু বম ও লুসাই ভাষার আদলে লিখিত হওয়ায় খিয়াংদের মধ্যে এটি সহজপাঠ্য হয়ে ওঠেনি। পরে সচেতন খিয়াং ব্যক্তিরা এটি সংশোধনের উদ্যোগ নেন। এ কাজে যুক্ত ছিলেন পাস্টর অংসাউ মংচ খিয়াং, থয়সাপ্রু খিয়াং, বাবু অং সা খিয়াং, বাবু রবার্ট বাদল খিয়াং ও বাবু শিমশোন খিয়াং। এ প্রসঙ্গে থয়সাপ্রু খিয়াং নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন:

> খিয়াং বর্ণমালা বিষয়ে যেহেতু কোনো সুরাহা হচ্ছে না, তাই আমি চিন্তা করলাম, নিজেদের বর্ণমালা বিষয়ে একটা সমাধানে আসা প্রয়োজন। তাই আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ... বিগত ৯-১১ অক্টোবর ২০০৭ ইং তারিখ বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার খামতাং পাড়াতে খিয়াং অ্যালফ্যাবেট নিয়ে ৩ দিনব্যাপী আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার খামতাং পাড়া ও ক্যয়কপালাং পাড়ার সর্বস্তরের মানুষ অতি উৎসাহের সাথে এসে খিয়াং ভাষার বর্ণমালা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেই তিনদিনে আমরা *খিয়াং প্রাইমার* বইটির অর্ধেকের মতো সংশোধন করে ফেলি। পরবর্তী ২০০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বাকি বইটির অংশ সংশোধনের জন্য পুনরায় খামতাং পাড়াতে যাই। তখন

> আমরা ৫-৬ দিনের মধ্যে বইটি পুরোপুরি সংশোধন করে ফেলি (থয়সাপ্রু খিয়াং, ২০২৩, পৃ. ২৩-৩৫)।

অতঃপর সৌভাগ্যক্রমে ২০০৮ সালে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা সাস, তৈমু ও জাবারাং-এর উদ্যোগে ৭টি ভাষায় মাল্টিলিঙ্গুয়াল এডুকেশন প্রোগ্রাম প্রকল্প গৃহীত হয় এবং তাতে খিয়াং ভাষাও অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু অন্তরায় যেন পিছু ছাড়ে না। খিয়াংদের মধ্যেও হরফ ও বর্ণমালা নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। মূলত বান্দরবানের ঘুংঘুরু-পাড়ার লাইতু গোত্রের খিয়াং, ক্যাসামং খিয়াং নিজের উদ্ভাবিত বর্ণমালা ব্যবহারের প্রস্তাব করলে এ মতানৈক্যর সূত্রপাত ঘটে। তবু কোংতু খিয়াংরা পূর্বের মতো রোমান বর্ণমালা দিয়েই ইউএনডিপির বহুভাষা শিক্ষা প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হন এবং 'খিয়াং ভাষা কমিটি' গঠন করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে শিশুদের পাঠ্য-উপযোগী পিপি-১-এর জন্য নিজস্ব রোমান হরফ ব্যবহার করে শিক্ষা-উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীকালে খিয়াং ভাষা কমিটির মাধ্যমে পুনরায় পিপি-২ পাঠ্য-উপযোগী থিম বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী পাঠ্যবই তৈরিও সম্পন্ন করা হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলায় খিয়াং মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে এমএলই স্কুল যেখানে খিয়াংভাষী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ইউএনডিপির প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে মাতৃভাষা স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে খিয়াংদের মাতৃভাষা-চর্চাও স্তিমিত হয়ে বর্তমানে বিপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অবিলম্বে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এবং সমগ্র খিয়াং জনগোষ্ঠী হরফ নিয়ে মতানৈক্য নিরসন করে ভাষা রক্ষায় এগিয়ে না এলে খিয়াং ভাষার বিপন্নাবস্থা থেকে সুরক্ষা অনিশ্চিত (থয়সাপ্রু খিয়াং, ২০২৩, পৃ. ২৩-৩৫)। তবে খিয়াং ভাষাকে বিপন্নাবস্থা থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা আশার আলো উদ্ভাসিত হয়েছে ২০১৭ সালে খিয়াংদের মাতৃভাষার হিয়ো বর্ণমালা ও ২০২৩ সালে হিয়ো বর্ণমালার ফন্ট ও কি-বোর্ড উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। গত বছর ২০২৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বান্দরবানে একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে খিয়াংদের মাতৃভাষা হিয়ো বর্ণমালার ফন্ট ও কি-বোর্ড জনসমক্ষে উদ্‌বোধন করা হয়। এ ঐতিহাসিক উদ্‌বোধনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চিংসাউ খিয়াং, চিংহ্লাউ খিয়াং, অংসাউ খিয়াং এবং হ্লাক্রয় খিয়াং। তাঁদের মতে, খিয়াং বর্ণমালা খিয়াং জনগোষ্ঠীর ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধারণ ও লালন করার উপযোগী করে করা হয়েছে। পাঁচজন মাতৃভাষাপ্রেমিক খিয়াং তরুণের নিরলস গবেষণার ফসল এ হিয়ো বর্ণমালা ফন্ট ও কি-বোর্ড। এ উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত সহায়তায় ছিল ফন্ট ও কি-বোর্ড প্রবর্তক প্রতিষ্ঠান ফিল-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ। তাঁরা হলেন মৃদুল সাংমা, সমর মাইকেল সরেন, বিভাষ দেওয়ান প্রমুখ (*প্রথম আলো*, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩)।

চাক, খুমি, লুসাই ও পাংখোয়াদের মাতৃভাষা-চর্চা

এ জাতিসত্তাগুলোর জনসংখ্যা খুবই কম। সব মিলিয়ে ৫ হাজারের কম। তাদের পৃথক পৃথক মাতৃভাষা আছে, কিন্তু একটিরও নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তিব্বতি-বর্মণভুক্ত চাকভাষা ছাড়া অন্য ৩টি ভাষা কুকি-চীন দলভুক্ত। ভাষা-গবেষকদের মতে, এ ভাষাগুলি সম্পূর্ণ পরস্পর পৃথক ভাষা নয়, বরং আন্তঃসম্পৃক্ত ভাষা। লুসাইরা মিজোরামেও আছে, তাদেরকে মিজো বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বম ও পাংখোয়াদের ভাষায় লুসাই ভাষার প্রভাব আছে (মনিরুজ্জামান, ২০০৬, পৃ. ৪৫)। লুসাইদের ব্যবহৃত বর্ণমালা পাংখোয়ারা ব্যবহার করে। পাংখোয়া গবেষক শাওন ফরিদ মিজো বা লুসাই ও পাংখোয়া ভাষার শব্দ-গঠন, বাক্য-বিন্যাস, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোক-কাহিনি ইত্যাদিতে মিল পেয়েছেন। তাঁর মতে, ''দিনে দিনে পাংখোয়া ভাষা মিজো ভাষার সাথে মিশ্রিত হয়েছে। মিজো বা লুসাই ভাষা একদিকে পাংখোয়া শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ

করেছে, অন্যদিকে তাদের সংস্কৃতির অনেক উপকরণ বিলুপ্ত ও প্রায়-বিলুপ্ত– জীবনধারা পরিবর্তনের কারণে অনেক আদি শব্দ হারিয়ে যাওয়ার পথে'' (ফরিদ, ২০০৬, পৃ. ৪৭)। একইভাবে বম ও পাংখোয়া ভাষার সাথে লুসাই ভাষার মধ্যকার মিল প্রায় ৭০ শতাংশ (জনি লুসাই, ২০০৭, পৃ. ১৯৯)। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে লন্ডন ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদ্রি লুরিয়ান এবং সেভিজ মিজোরামে লুসাইদের প্রথমে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পাদ্রি লুরিয়ান লুসাই অভিধান লেখার জন্য লুসাই ভাষার উপযোগী করে রোমান হরফ তৈরি করেন। বর্তমানে পাংখোয়ারা সেটাই ব্যবহার করছে (পাংখো, জুমজার্নাল, প্রবেশ ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪)। শুধু তাই নয়, পাংখোয়াদের বর্ণপরিচয় শুরু হয় লুসাই ভাষায় রোমান হরফে লিখিত 'Zirtan Bu' শিরোনামের বাল্যশিক্ষার বই দিয়ে (ফরিদ, ২০০৬, পৃ. ১৮২)। আবার খিয়াং ভাষার সাথেও লুসাই ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে (খিয়াং, ২০০৭)। খ্রিষ্ট-ধর্মাবলম্বী খুমীরা রোমান লিপি ব্যবহার করে। তারা ২৫টি রোমান লিপি নিজেদের উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যবহার করে। তবে এ হার মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ২৫ ভাগের বেশি নয় (লেলুং খুমী, ২০১৫, পৃ. ১২১-১৪৪)। চাক জনগোষ্ঠী রোমান হরফে লিখন-কার্য সমাধা করে। চাকদের ভাষায় প্রায় ৬০-৬৫% বর্মি ও আরাকানি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। পূর্বে চাকরা বৌদ্ধ মন্দিরে বার্মিজ বর্ণমালা শিখত এবং ভাষা-লিখনের কাজ বর্মি বর্ণে করতো। কিন্তু একসময় সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে চাক ভাষায় বর্ণমালা তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মং মং চাক। তিনি ইতোমধ্যে চাকদের কথ্য-ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী ১১টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ তৈরি করেছেন। পাশাপাশি ই-কার এবং উ-কারের উচ্চারণ তৈরি করেছেন। গণনা-কাজের জন্য সংখ্যাও তৈরি করেছেন, যা চাক সমাজে বেশ আগ্রহ ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চাক জনগোষ্ঠীর ধারণা, তাদের মাতৃভাষা নিজস্ব বর্ণমালায় লিখিত আকারে সংরক্ষণ করতে না পারলে আগামীতে বর্তমান কথ্য-ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে এবং জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বও সংকটের মুখে পড়বে (চাক ও চাক, ২০১৫, পৃ. ১৬৬-২০১)। আশঙ্কার কথা হচ্ছে, এ চারটি ভাষাই এখন বিপন্ন-ভাষার তালিকাভুক্ত। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৮ সালে পরিচালিত জরিপে দেশের যে ১৫টি বিপন্ন ভাষা শনাক্ত হয়েছে, তার মধ্যে চাক, খুমি, খিয়াং ও লুসাই ভাষাও অন্তর্ভুক্ত আছে।

ভাষা ও বর্ণমালার সামাজিক প্রয়োগ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার স্ব স্ব পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে মাতৃভাষায় যোগাযোগ, ভাবের আদান-প্রদান বা কথোপকথন চলে। যদিও প্রভাবশালী ভাষাগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ালেখা, স্মার্টফোন ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতির কারণে তারা মাতৃভাষার কথ্যরূপের কিছু শব্দ কম ব্যবহার করে তদস্থলে বাংলা বা ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করছে। আশার কথা হচ্ছে, নিজেদের মাতৃভাষা-চর্চায় চাকমা ও মারমাদের মধ্যে বাংলালিপির পরিবর্তে নিজস্ব লিপি ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়ছে। পাঠ্যপুস্তক এবং সাহিত্যচর্চা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যানারে, বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে, তোরণের পোস্টারে, ফেসবুক আইডি ও টিশার্টের ডিজাইনে চাকমা ও মারমা বর্ণমালার ব্যবহার বেড়েছে। বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের স্মরণিকা, পরিচিতি-পুস্তিকায় বাংলার পাশাপাশি চাকমা অক্ষরের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ও চাকমা লিপির ব্যবহার প্রসারের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ''আমার দপ্তরে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকমা লিপি ব্যবহার করি। পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলেও চাকমা লিপির ব্যবহার ধীর গতিতে হলেও বেড়ে চলেছে'' (রায়, ২০১৫, পৃ. ৩০)। একইভাবে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ককবরক ভাষার লেখ্যরূপে বঙ্গলিপির পরিবর্তে রোমান

লিপিকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ অনুবাদেও আদিবাসী মাতৃভাষার লেখকেরা সক্ষমতা প্রমাণ করেছেন।

বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলোর মাতৃভাষা উন্নয়ন কার্যক্রম

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি– এ তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট আছে। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০)। তিনটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্ব স্ব জেলায় অবস্থিত জাতিসত্তাগুলোর পৃথক পৃথক মাতৃভাষার সাক্ষরতা প্রদানে বিভিন্ন-মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে স্ব স্ব মাতৃভাষা ও বর্ণমালায় রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বান্দরবান সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিবছর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনটি আদিবাসী ভাষায়– মারমা, বম ও ম্রো– সাহিত্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এভাবে সীমিত পর্যায়ে হলেও বিভিন্ন জাতিসত্তার সদস্যরা সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আয়োজিত এ সমস্ত কর্মসূচিতে শরিক হয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির ও ভাষা-সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে জাতিগত স্বকীয়তা বজায় রাখার সুযোগ পাচ্ছে (উ চ নু, ২০০৭, পৃ. ১৪৫-১৫১)। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিজস্ব উদ্যোগে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার অভিধান প্রণীত হয়েছে, যা মাতৃভাষা অধ্যয়নে সহায়ক হবে।

মাতৃভাষা গবেষণা, উন্নয়ন ও বিস্তার এবং শিক্ষাদানে অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি

পার্বত্য অঞ্চলে বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ভাষা গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদকে (২০২১) ভূষিত হন। তাঁর পদকপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা-গবেষকের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। ২০২৪ সালে চাকমা ভাষায় নাট্যসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অবদানের জন্য মৃত্তিকা চাকমা বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এভাবে বিভিন্ন জাতিসত্তার লেখক, গবেষক ও সাহিত্যিকদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় রচিত গবেষণা ও সাহিত্যকর্মগুলো জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন পাচ্ছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পাঠদান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এ উদ্যোগটি ভাষার দিক থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দর্শনের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথম ধাপে সারা বাংলাদেশের ৫টি আদিবাসী ভাষার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আদিবাসী তথা নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে বাছাই করা হয়। সেগুলো হলো চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের ককবরক

ভাষা। তারই আলোকে এনসিটিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১৬ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৮টি শিখন-দক্ষতা সম্বলিত প্রাক-প্রাথমিকের বই এবং ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই ও শিক্ষাসামগ্রী মুদ্রণ ও বিতরণ সম্পন্ন করেছে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হলেও পাঠদানের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়– একই শ্রেণিতে একাধিক বা বহু মাতৃভাষাভাষী শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এবং তদনুসারে সমসংখ্যক ভাষায় পারদর্শী শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি। এছাড়াও আছে দৈনন্দিন শ্রেণি-কার্যক্রমের তালিকায় মাতৃভাষায় প্রণীত পাঠ্যবইগুলো পাঠদানের পিরিয়ড বা সময় বরাদ্দ না থাকা, ধারাবাহিক, সামষ্টিক বা বার্ষিক মূল্যায়ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনার অভাব, বাস্তবায়নকারী দপ্তর বা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি সমস্যা। মারমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লেখক-দলের সদস্য অংক্যজাইয়ের মতে, মারমাদের মাতৃভাষায় সাক্ষরতা এখনো মারমা বৌদ্ধভিক্ষু ও বয়স্কদের মধ্যে বেশি যা পরম্পরাগতভাবে হয়ে আসছে। কিন্তু মারমা ভাষায় রচিত এনসিটিবির পাঠ্যবইগুলো এবং শিক্ষা-উপকরণগুলোর সুফল এখনো প্রাথমিক স্কুলের শিশুরা পাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ শিক্ষকদের স্ব স্ব মাতৃভাষার অক্ষরে সাক্ষরজ্ঞান না থাকা এবং পাঠদান-পদ্ধতির উপর অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শেখানোর জন্য মাতৃভাষায় পারদর্শী শিক্ষকের অভাব প্রায় সাধারণ সমস্যা। যারা মাতৃভাষায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন সেসব শিক্ষকেরাও মাতৃভাষা শেখানোর ব্যাপারে উদাসীন (চাকমা, ২৮শে এপ্রিল, ২০২৪)। বান্দরবানের মারমা ভাষাবিদ উচিমং মারমার অভিমত হলো:

> একই শ্রেণিতে বাংলা, মারমা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, ত্রিপুরা এরকম মিশ্র ভাষার শিক্ষার্থীর উপস্থিতি থাকায় শিক্ষকেরা শুধু একটি নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পাঠদানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এ সমস্যা সমাধান নিয়ে বহুভাষা-বিশেষজ্ঞদের আরো গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। তিনি আরও মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যগুলো পাঠদানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও তদারকি দরকার। অন্যথায় এ মহৎ উদ্যোগের সুফল যেমন পাওয়া যাবে না, তেমনি পুস্তক-রচয়িতাদের মেধা, শ্রম, সময় এবং সরকারের বিপুল অর্থের অপচয় হবে মাত্র (মারমা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।

প্রাথমিক শিক্ষা পার্বত্য জেলাপরিষদগুলোর নিকট হস্তান্তরিত বিভাগ হওয়ায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাদেরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ দরকার বলে মনে করেন লেখক ও শিক্ষক আর্যমিত্র চাকমা। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয়, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কাজটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে মনিটরিং ও সমন্বয়ে ঘাটতি রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের গবেষণা কর্মকর্তা ও চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা গবেষক শুভ্রজ্যোতি চাকমাও মাতৃভাষা শিক্ষাদানের হালহাকিকত নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে:

> আমরা প্রায়ই শুনে থাকি মাতৃভাষার বইগুলো পড়ানোর জন্য এখনো উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি হয়নি। এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। মাতৃভাষার বই পড়ানোর বিষয়ে অধিদপ্তর প্রদত্ত রুটিনে উল্লেখ নেই। বিদ্যালয়ভেদে যে যার মতো বইগুলো দায়সারাভাবে পড়াচ্ছেন। এই যদি বাস্তবতা হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই হতাশ হবো (*যুগান্তর*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)।

অন্যদিকে আর্থিক প্রণোদনার অভাব এবং স্থায়ী শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের অভাবের কারণে মাতৃভাষায় সাক্ষরতা প্রদানে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলায় সমভাবে সক্রিয় হতে পারছে না। এছাড়া কোনো আদিবাসী ভাষাতেই শিক্ষিত পাঠকসমাজ গড়ে ওঠেনি। কোনো জনগোষ্ঠীর বর্ণমালা ও শব্দগুলোতে উচ্চারণ, বানানরীতি, ব্যাকরণ নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত নিয়ম-রীতি প্রণয়ন করা যায়নি। খিয়াংদের মধ্যে এখনো বর্ণমালা বাছাই নিয়ে মতদ্বৈধতা বিদ্যমান। কিন্তু এটা ঠিক, সরকারি অর্থ-ব্যয়ে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে তিনটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা-কার্যক্রম শুরু হয়েছে, সেগুলোর সাফল্যই অন্য ভাষাভাষী নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা-চর্চায় উৎসাহ জোগাবে। তাছাড়া মাতৃভাষা-চর্চার সঙ্গে জীবন-জীবিকা বা অর্থনৈতিক মূল্য যুক্ত না হলে মাতৃভাষা-শিক্ষা আকর্ষণীয় হবে না। দ্রুত সমস্যা চিহ্নিত করে এ মহৎ উদ্যোগটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশিত। প্রকৃতপক্ষে ভাষা-শিক্ষার কাজটি কোনো একক কাজ নয়। এটি একটি বহুমুখী এবং নিরন্তর প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাপ্রশাসন, জেলা পরিষদ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে যদি শিশুদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুদূরপ্রসারী উপকারের কথা বোঝানো না যায়, তাহলে মাতৃভাষা-চর্চা ও শিক্ষাদান বাধাগ্রস্ত হবে। বস্তুত সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কেবল মাতৃভাষা শিক্ষাদান কর্মসূচিকে সফল করতে পারে।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো সীমিত পরিসরে হলেও তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা চর্চা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের অব্যাহত প্রয়াস চালিয়েছে। এ প্রয়াস ছিল ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক। রাষ্ট্রীয় ভাষানীতি ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় তাদের মাতৃভাষা-চর্চায় গতি ও সমন্বয়ের অভাব প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে এসব রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে অপসৃত হয় এবং চুক্তিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা-সংক্রান্ত বিধান রাখায় মাতৃভাষা-চর্চার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হয়। চুক্তিসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে স্পষ্ট বিধান থাকায় মাতৃভাষা-চর্চার পরিসর সৃষ্টি হয়। এর দু'বছরের মাথায় ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চর্চায় নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়। এর ফলে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও ভাষা-নীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হলে এবং ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতেও আদিবাসীদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলে পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসত্তাগুলো মাতৃভাষা-চর্চায় বেশকিছু নীতিগত সহায়তা লাভ করে। বাংলাদেশ সরকার মাতৃভাষা-চর্চা প্রসঙ্গে নতুন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ায় মাতৃভাষা গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটে। একইভাবে বাংলাদেশ সরকার বাংলাসহ দেশের অন্য নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা শিক্ষাদান, গবেষণা ও উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ করে। বিশ্ব-সংস্থায় মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা, একুশের চেতনার বিশ্বায়ন, বাংলাদেশ সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ প্রভৃতি ঘটনা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চায় নবচেতনার সঞ্চার করে। বিশেষত ২০১৪ সাল থেকে সরকারিভাবে ৫টি নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নের কর্মসূচির ফলে নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-

শিক্ষা ও চর্চা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চর্চার ধারায় একটি বড়ো টার্নিং পয়েন্ট। চুক্তির পর দেশের জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি পার্বত্য এলাকার নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। অংশত এসব সংস্থার কর্মসূচির আলোকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎসাহী তরুণদের প্রচেষ্টায় মাতৃভাষা-চর্চার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্রোদের মাতৃভাষা চেতনা ও বর্ণমালা উদ্ভাবনের প্রয়াস সত্যি প্রশংসনীয়। একইভাবে চাকমা তরুণদের স্বেচ্ছায় গড়ে তোলা মাতৃভাষা চর্চার সংগঠন– 'চাঙমা বাহিত্য বাহ' ও 'নোয়ারাম সাহিত্য সংসদ'– অন্যদের জন্য প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত। তাদের বেশকিছু ভাষাভিত্তিক সংগঠন মাতৃভাষায় সাক্ষরতা প্রদানের জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মাতৃভাষা-চর্চায় আরেকটি বড়ো অগ্রগতির প্রতীক হলো ভাষা ও বর্ণমালা উন্নয়নে প্রযুক্তির প্রয়োগ। স্বেচ্ছাব্রতী তরুণদের প্রচেষ্টায় চাকমা, মারমা ও ম্রোদের বর্ণমালা লেখার কি-বোর্ড উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে, যা পাঠ্যবই লিখন ও মুদ্রণের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল।

এছাড়া কিছু অন্তর্নিহিত প্রতিবন্ধকতার কথাও গবেষণায় উঠে এসেছে। যেমন, সরকারের মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলো পাঠদানে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়নি। সকল শিক্ষককে মাতৃভাষা বা বহুভাষায় পাঠদান-পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়নি। অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা না থাকা এবং হরফ নির্বাচন নিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যকার জটিলতা ও মতানৈক্য ছিল মাতৃভাষা-চর্চার পথে অন্যতম বড়ো বাধা। এছাড়া ভাষা, ব্যাকরণ, বানানরীতি, শব্দভান্ডার, ধ্বনি ও উচ্চারণ প্রভৃতির সমস্যা ছিল। এসব কাটিয়ে উঠতে নিরন্তর চর্চা প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষাচর্চার প্রতি সামাজিক সচেতনতা ও উদ্যোগ। সর্বোপরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকলে এবং ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষায় শিক্ষাও অদূর ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত হবে।

তথ্যসূত্র

আপেং (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০১০)। রাঙ্গামাটি: জাক।

আহ্‌মদ, সালাহ্‌উদ্দীন। (২০১৬)। *ইতিহাসের সন্ধানে*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

কবির, মো. এনামুল। (২০১৯)। *সচিত্র বাংলাদেশ* (দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা) ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।

কাওয়াং (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০০৪)। রাঙ্গামাটি: জাক।

কামাল, মেসবাহ; ইসলাম, জাহিদুল; চাকমা, সুগত। (২০০৭)। *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫: আদিবাসী জনগোষ্ঠী*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

কেদাকতুক (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০১২)। রাঙ্গামাটি: জাক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। (২০২৪)। *একুশে পদক ২০২৪: পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চাকমা, বিভূতি। (২০১৮)। *প্রযুক্তিতে চাকমা ভাষার উন্নয়ন*। রাঙ্গামাটি: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য। (২০১৫)। *বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

চাকমা, শুভ্রজ্যোতি। (২০১৬)। 'চাকমা বর্ণমালার ব্যবহার: অতীত ও বর্তমান' *দ্বিতীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন স্মারক সংকলন*। রাঙ্গামাটি: পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক ফোরাম ।

চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রাইটার্স ইউনিয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম। *চতুর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন-২০২৩ স্মারক সংকলন*।

চাকমা, সুখেশ্বর সম্পাদিত। (২০২১)। 'জাক'র ৪০ বর্ষপূর্তি সংকলন-২০২১'। রাঙ্গামাটি: জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)।

চাকমা, রনেল (সম্পা.)। (২০০৩)। *আমাঙ* (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০০৩)। রাঙ্গামাটি: জাক।

চাকমা, অম্লান (সম্পা.)। *লাম্প্রা* (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০০০)। রাঙ্গামাটি: জাক।

চাকমা, জ্যোতি। *(২০১৩)*। 'চাকমা বর্ণমালার ইউনিকোড ফন্ট তৈরি প্রসঙ্গে কিছু কথা' *সাংগ্রাই*। রাঙ্গামাটি: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

চাক, মংমং ও চাক চিংহ্লাম। 'চাক'। চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য (সম্পা.) (২০১৫)। *বাংলাদেশের আদিবাসী*। এথনোগ্রাফিয় গবেষণা প্রথম খণ্ড। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

চৌধুরী, মংসানু; জেন, উ ক্য। (২০১৮)। *মারমা: ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। খাগড়াছড়ি: মারমা উন্নয়ন সংসদ।

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)। (২০০৫)। 'জাক'র ২৫ বর্ষ পূর্তি সংকলন'। রাঙ্গামাটি: জাক।

ত্রিপুরা, প্রশান্ত। (২০১৫)। *বহুজাতির বাংলাদেশ*। ঢাকা: সংবেদ।

পাইং আমুঙ, মাহা সাংগ্রাই সংখ্যা, ২০১৮। খাগড়াছড়ি: মারমা উন্নয়ন সংসদ।

বিশ্বাস, অশোক। (২০০৮)। *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মারমা, মিথোয়াইচিং সম্পা.। (২০১১)। *চেদনা*। বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল। কেন্দ্রীয় কমিটি, চট্টগ্রাম।

ম্রো, সিং ইয়ং। (২০১৯)। *ম্রো জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি*। বান্দরবান: বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

রায়, চাকমা রাজা দেবাশীষ। 'বাংলা হরফে চাকমা ভাষা উচ্চারণের সমস্যা ও তার সমাধান' কীর্তি নিশান চাকমা (সম্পা.) (২০১৫)। *মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ*। রাঙ্গামাটি: মোনঘর প্রকাশন।

সিকদার, সৌরভ। (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সাহু, জির কুং। (২০০৪)। 'বোম উপজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' *কাওয়াং*। রাঙ্গামাটি: জাক।

Akanda, Safar Ali. (2013). *Language Movement and The Making of Bangladesh.* Dhaka: The University Press Ltd.

পত্রিকা

কালের কণ্ঠ, ২২শে জুন, ২০২৪।

'খেয়াং বর্ণমালার ফন্ট ও কি-বোর্ড উদ্বোধন'। *প্রথম আলো*, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪।

ত্রিপুরা, মথুরা বিকাশ। 'ভাষা নিয়ে মথুরার স্বপ্নযাত্রা' *যুগান্তর*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিদের পরিচিতি

দেবপ্রিয় চাকমা, লেখক, ভাষা গবেষক ও সাবেক সভাপতি, চাঙমা সাহিত্য বাহ্, নিউজিল্যান্ড, খাগড়াছড়ি। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ৯ ও ১০ই এপ্রিল, ২০২৪ (মেসেঞ্জার কলের মাধ্যমে)।

মুকুল কান্তি ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ভাষা গবেষক ও প্রভাষক, রাঙামাটি পাবলিক কলেজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ২৬শে এপ্রিল, ২০২৪ (মেসেঞ্জার কলে)।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, ভাষা গবেষক, লেখক ও নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, স্থান: গবেষকের চট্টগ্রামস্থ বাসা)

বিনয় কুমার চাকমা, প্রাথমিক শিক্ষক ও চাকমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি। (মোবাইল কলের মাধ্যমে)।

ইনজেব চাকমা, নোয়ারাম সাহিত্য সংসদ, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি। ৩০শে জুন, ২০২৪ (মেসেঞ্জার কলের মাধ্যমে)

উচিমং মারমা, মারমা ভাষাবিদ, বান্দরবান সদর, মারমাভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন কমিটির যাচাই ও মূল্যায়নকারী, তারিখ: ২৩শে সেপ্টেম্বর (মোবাইলের মাধ্যমে)

অংক্যজাই মারমা, মহালছড়ি, মারমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন দলের সদস্য। তারিখ: ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪। মোবাইলের মাধ্যমে।